বাউল মন

অরুণ কাঞ্জিলাল

গ্রামের বাড়ি। শনের ঘর। তারই দাওয়াতে চওড়া পাটি পেতে বসেছে গান শিক্ষার আসর। কোলকাতার ডোয়ারকিন কোম্পানির হারমোনিয়াম আর শিক্ষাগুরু খ্যাতনামা আঞ্চলিক গায়ক রশিদ মিঞাঁ। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শিক্ষার্থিনী, আমি তাদের সহযোগী, যোগাড়ে মাত্র। ফাঁক পেলেই যন্ত্রটা ধরে একটু সা রে গা মা বাজাই। আর যদি সঙ্গীত গুরু বলেন, সা পা টিপে ধরে একটু ব্লো করে যা তো ভাই, দিদি একটু গলা ছেড়ে গাক; তবে আমায় পায় কে। শিক্ষা তেমনি কিছু হল না। তবে যন্ত্রটার সান্নিধ্যে থেকে বাজনাটা শিখে নিলাম। তখনকার মতো হারমোনিয়াম শিখেই ধন্য হলাম। তবে পরিবেশের আনুকূল্যেই কবে যে কখন সঙ্গীতের ভিখারি হয়ে গিয়েছিলাম, জানি না।

গুরু গাইতেন 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়'—লালন সাঁইয়ের গান। গানটা শুনতেই শুরু হত আত্ম-অন্বেষণ। ধমনীতে বেড়ে যেত রক্তস্রোত। সর্বাঙ্গে ফুটে উঠত এক আর্তি, 'কে এই অচিন পাখি?' সে এক আলাদা অনুভূতি। ঘর ছেড়ে বিবাগী হতে মন করত।

কানাই ছিল আমার বাল্যবন্ধু। ওর ছিল একটা কীর্তনের দল। প্রথমে ওর সঙ্গ নিলাম। নাম কীর্তন, ছুট কীর্তন, সাধারণ কীর্তনে হারমোনিয়াম বাজাবার ডাক পড়ত। ডাক পড়লেই নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কানাইয়ের গলার স্বর আমায় আকৃষ্ট করল। অতিরিক্ত বন্ধুত্বে শিখে নিলাম কিছু গান, নাড়া বেঁধে হলাম গানের ছাত্র। জীবনের উপর দিয়ে বয়ে চলল কীর্তনের প্রবাহ। একাধারে বাজিয়ে আবার গাইয়ে। লেখাপড়া জানা ছেলে হিসেবে দলে হিসাব-রক্ষকের ভারও পেলাম। সব মিলিয়ে দলে সম্ভ্রম বৃদ্ধি। ঘর ছেড়ে হারমোনিয়ম কাঁধে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনে মনে ভাবছি, আমি কী হনুরে। শেষমেশ লালন ফকিরের গানটাই আমাকে বিবাগী করে দিল।

'রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি / অনন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।'
দোহাররা ধুয়া তুলত, 'অনন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।'
এইভাবেই দিনগুলো এগিয়ে যাচ্ছিল।

কানাই সম্বন্ধে আরও কিছু বলা দরকার। ওর পুরো নাম কৃষ্ণচন্দ্র কীর্তনিয়া। বিন্যস্ত সুদীর্ঘ কেশ, কপালে রেখাতিলক, গলায়-বাহুতে কয়েক লহর নানা রঙের কাঠ ও বীজের ডাবকা মালা, শুক্লাভ দেহবরণ। কীর্তনের সময় আলগা দেহে এক উড়নী জড়াত। মনে হত কোন শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করে গড়েছেন দেহখানি। জাতে বারোজীবী। শুনেছি ওর বাপ-ঠাকুর্দা পূর্ববঙ্গে ডাকাত ছিল। রণ-পায় চেপে তারা আসত শেষ রাতের দিকে। কোথা থেকে আসত আবার কোথায় চলে যেত, কেউ জানত না। চৈত্র মাসের ঝড়ের মতো শোনা যেত তাদের আগমন-শব্দ। কিছুই সামাল দেওয়ার সময় পাওয়া যেত না, আবার উধাও হয়ে যেত চোখের নিমেষে। যে বাড়িতে ডাকাতি করত সে বাড়ির সুলুক সন্ধান আগেভাগেই জেনে নিত। ডাকাতরা সরাসরি গৃহস্বামীর ঘরের সামনে গিয়ে দুই লাথিতে দরজা ভেঙে চুলের মুঠি ধরে তাকে খাট থেকে নামাত। এরপর এক কোপে তাকে শেষ করে এক ঝটকায় বিছানা থেকে তোশকটা তুলে নিত। তারা জানত, গৃহস্বামীর সব টাকা ওই তোশকেই সেলাই করা।

দেশভাগের আগুপিছু শুরু হল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। তাতে জড়িয়ে পড়ল কানাইয়ের বাপ-ঠাকুর্দা। কেবল বেঁচে থাকার তাগিদে উপযুক্ত স্থান বিচার করে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসতে হয়েছিল উত্তর চব্বিশ পরগণার নিমতা গ্রামে। বংশপরম্পরায় পাওয়া ডাকাতি প্রতিভা সুপ্ত রয়ে গেল।

পরের প্রজন্মের কৃষ্ণচন্দ্র হল সম্পূর্ণ বিপরীত। সুরতালের অপরূপ কারুকার্যে শ্রোতাদের মনপ্রাণ কেড়ে নেওয়ায় তার জুড়ি মেলা ভার। কীর্তনের মঞ্চ জুড়ে প্লাবন বয়ে যেত। আর শ্রোতারা ভাবের প্রবল স্রোতে ভেসে যেত। কীর্তনিয়া কানাই ঋদ্ধ হত।

আমাদের দলে মূল গায়েন কানাই। তার সম্বন্ধে আগেই বলেছি। কানাই ছাড়া আমরাই বাজিয়ে, আমরাই দোহার। বাজিয়েরা অনেকটা রান্নায় সরষের ফোড়নের মতো। সরষে যেমন রান্নায় পড়েই খাবারকে আরও সুস্বাদু করে তোলে, ওস্তাদ বাজিয়েরা সংগতের মধ্য দিয়ে কীর্তনকে আরও শ্রুতিমধুর করে তোলে। আমাদের প্রধান বাজিয়ে বীরেশ্বর ও তার ভাই ধনেশ্বর। বীরেশ্বর

বাজায় 'শ্রীখোল'। আর ধনেশ্বর বাজায় করতাল। করতালের নিজস্ব কোনও বোল নেই। সে মূলত শ্রীখোলের সহায়ক। বাঁশিয়াল বিরাটির বংশী কাউলাত। আমি অকৃতী, অধম, হারমোনিয়াম বাজাই। এই নিয়েই আমাদের দল। কানাইয়ের এক ভাই বলাইচন্দ্র। শুনেছি তার আলাদা পেশা আছে, তাকে অবশ্য আমি কোনোদিন দেখিনি।

সে বছর প্রচুর বায়না আসছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লাউহাটি, খড়িবেড়ে, রাজারহাট থেকে। মেছুড়েদের গ্রাম, বিলের পর বিল, মাছের ভেড়ি। তারই মাঝে 'খড়িবেড়ে মৎস-পাইকার বাজার।' পাইকাররা অর্থবান। সন্তান জন্মাবার পরে কীর্তন, ষষ্ঠীর রাতে কীর্তন, গৃহ-সঞ্চারে কীর্তন, অসুস্থতা নিবারণে কীর্তন, গরু বাচ্চা দিলে কীর্তন, সর্বশেষে শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তন। মৃতের আত্মার শান্তিতেও হল, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একটু আনন্দের বাঁটোয়ারাও হল। সন্ধ্যার স্তিমিত আলো, মাঠময় পৃথিবী, ফাঁকে ফাঁকে ঘর, আর মিটিমিটি আলো। নিঃসীম নিস্তব্ধতার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার এক মেঠো পথে, একই পথ চলেছে মাঠ থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে মাঠে। কোথাও পথের একধারে গ্রাম, কোথাও বা দু-ধারে। কোথাও আম-কাঁঠাল, কোথাও শাল-জারুল আবার কোথাও বাঁশবেতের জঙ্গল। হঠাৎ দূরে কোনও গৃহস্থ বাড়িতে দেখা যায় কতিপয় হ্যাজাক্ বাতির আলো, বহু লোকের ভিড়, মাঝে মাঝে খোল-করতালের মেল-জমাটের কলরব আর তারই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ভেসে আসে উচ্চগ্রামে গাওয়া কিছু পুরুষকণ্ঠের মিলিত সুর, 'রণমাদল বাজেরে, ধাঁ ধাঁ ধিনিক ধাঁ।' দল বেঁধে কেউবা হ্যারিকেন হাতে, কেউ বা পাটকাঠি জ্বালিয়ে চলেছে ওই দিকে। আবরণের বালাই নেই, শীতগ্রীষ্ম বোধ নেই, নিমন্ত্রণের অপেক্ষা নেই, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কোথায় যাচ্ছ গো? মেঠো উচ্চারণে উত্তর আসবে, গান শুনতে। কী গান? রামায়ণের গান অথবা কীর্তন। কীর্তন হল গান, তার সঙ্গে জুড়ে আছে নাটক আর শ্রোতাদের প্রত্যাশা। আহা সে যে কী আকর্ষণ, প্রত্যক্ষ করেছি বলেই বলতে পারছি।

শীতের মাঝেই হল একটানা বৃষ্টি। হাড় কাঁপানো শীত আর বিলের জলে সোঁ সোঁ আওয়াজ। মানুষের মৃত্যুর হার গেল বেড়ে। আনুপাতিক হারে কীর্তনের পালাও বেড়ে গেল। কানাইকে গৃহস্বামীরা ভগবান মনে করে। ডাকে ঠাকুর বলে। রাতে শুতে দেয় ওদের অন্দরমহলে, শোবার ঘরে বড় তক্তপোশে। বাজিয়েদের স্থান হয় বাহির বাড়িতে নতুবা পাটের গুদামে। সকালে উঠেই

হারমোনিয়াম কাঁধে বেরিয়ে পড়ি নতুন বায়নায়। পথ নয় যেন একটা মালার সুতো, চালতা ফুলের মতো ছোট ছোট পল্লিগুলোকে গেঁথে প্রকৃতির গলায় পরিয়েছে এক বনগ্রামের মালা। কখনও পায়ে হেঁটে মাঠের আল ভেঙে, কখনও গরুর গাড়িতে, কখনও বা নৌকায়। রিহার্সালের প্রয়োজন নেই, কানাইয়ের কণ্ঠ সুরে ভরা, নানা ধরনের গমক সৃষ্টিতে পটু। কীর্তনে গলাই হল সবচেয়ে বড় যন্ত্র। বীরেশ্বর আর ধনেশ্বর, ওদের সমবেত খোল-করতাল যেন কথা বলে। বীরেশ্বরের ছোট ছোট হাতের ঠেকা কীর্তনের পরিবেশটাকে মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। আর করতাল? কীর্তনে যখন মাতন শুরু হতো তখন স্বল্পভাষী ধনেশ্বরের করতাল, জগঝম্প একসঙ্গে বেজে উঠত। গানের ধ্বনি মাঠ, গ্রাম পার হয়ে সুদূরপ্রসারী হত।

বর্ধমান জেলার 'শ্রীখণ্ড' গ্রাম। বর্ধমান-কাটোয়া লাইট রেলপথে কাটোয়া থেকে সাত কিলোমিটার দূরে শ্রীপাট শ্রীখণ্ড। এর পরের স্টেশনের নাম প্রায় একই—'শ্রীখণ্ড'। শ্রীখণ্ড স্টেশনে নেমে খানিকটা গ্রামের মধ্যে হেঁটে গেলেই জমিদার বাড়ি। জেলার অন্যতম সুন্দর গ্রাম। ন্যূনতম দেড় মাইল পাড় বাঁধানো কোপাই নদী, সামনে সারি দেওয়া তাল-সুপারীর গাছ। জমিদারের সুবিশাল বাড়ি। বাড়ির সামনে নদী। নদীতে নিজস্ব ঘাট। জমিদারের একসময় হাতি ছিল। এখন জমিদারি নেই। হাতিও নেই। তবে বিজ্ঞ সঙ্গীতপ্রিয় জমিদার আছেন। তাঁর মাও বেঁচে আছেন। পারিবারিক সংস্কার ছিল বৈষ্ণবীয়। তাই মাঝে মাঝে কীর্তনের অনুষ্ঠান বসান বাড়িতে। কানাইয়ের তখন খুব নাম-ডাক। বায়নায় যিনি এসেছিলেন, তিনি জানালেন জমিদার বাবুর ইচ্ছে কিছু কিশোর বালক-বালিকাকে বেশভূষায় সাজিয়ে নিয়ে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা করা। আমরা কৃষ্ণলীলা গাই। তাই কিছুটা অনুশীলনের প্রয়োজন হল। নির্দিষ্ট দিনে শ্রীখণ্ডে পৌঁছে গেলাম। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিরাট আয়োজন। সন্ধে থেকেই প্রচুর জনসমাগম। আগের রাতে হয়েছে 'কৃষ্ণ সুদামা'। তার রেশ তখনও বর্তমান। সেদিন কানাইকে যেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভর করলেন।

স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী। স্থান বহির্দেশ। ফুলে সাজে সজ্জিত নিদ্রাগত বিষ্ণুপ্রিয়াকে রেখে নিমাই-এর গৃহত্যাগ—

নিদ্রাগত বিষ্ণুপ্রিয়া, ধীরে ধীরে উঠি শয্যা হতে
আসিয়াছি গৃহ পরিহরি, আর নাহি ফিরিব গৃহেতে,
এই মোর শেষ গৃহ করা, এইবার চল ইচ্ছামতো।

কানাইয়ের নাটকীয় উপস্থাপনে শ্রোতারা বিহ্বল হয়ে পড়ল। তারা সাময়িকভাবে ভুলে গেল কোনটা বাস্তব কোনটা কল্পনা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র পরিবেশটা এক অপূর্ব মাদকতায় ভরে থাকল। জমিদারের বৃদ্ধা মা চোখে জল নিয়ে মঞ্চে উঠে কানাইকে প্রণাম করলেন। গলায় পরিয়ে দিলেন সোনার হার। জমিদার দিলেন টাকার মালা। গানের শেষে বাড়ির উঠোনে ওজনের হরিলুট। রাতে খাওয়ার পাতে পড়ল গাওয়া ঘিয়ের লুচি ও মোহন ভোগ। খাওয়াটা বেশ পালাকীর্তনের মতোই জমে উঠল। কানাই স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, তার স্থান হল অন্দরমহলে, সম্ভবত শোবার ঘরে। আমাদের স্থান হল জমিদার বাড়ির হাতিশালে। রাতে বীরেশ্বর আমার পাশে শুয়ে অনেকক্ষণ উসখুস করছিল। আমি বললাম, 'বেশ বাজিয়েছ ভাই।' সে বলল, 'সবই গোবিন্দের ইচ্ছা।' কীর্তনিয়ারা এইভাবেই কথা বলে। রাতের প্রথম প্রহর পার হয়ে গেল। দূরে কোথায় যেন শিয়াল ডেকে উঠল। বীরেশ্বর তখনও ঘুমায়নি। বললাম, 'কী হল, ঘুম আসছে না, গুরুভোজন হয়ে গেছে?' সে বলল, 'গোঁসাই, আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।' আমি বললাম, 'বলুন না, এখানে তো আর কেউ নেই।'

বীরেশ্বর বলল, 'এই যে আপনি পরিবার, পরিজন ছেড়ে কীর্তনিয়াদের দলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—আপনার কী লাভ?'

বললাম, 'লাভ-ক্ষতির হিসেব করে তো আসিনি ভাই। ভালো লাগছে তাই ঘুরছি। আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ। ভালো না লাগলে চলে যাব।'

'শুনেছি পয়সাকড়ি কিছুই নেন না।'

'না, তবে সেই হিসাবটা কানাইয়ের সঙ্গে আমার। ও আমার ছোটবেলার বন্ধু। গুণী মানুষ। ওর সঙ্গে থেকেই তো বিশ্বসংসারটাকে জানছি।'

বীরেশ্বর পাশ ফিরে শুলো। মস্ত একটা হাই তুলে বলল, 'জগৎসংসার চেনা এত সহজ কাজ নয়। এ লাইন আপনার জন্য নয়। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।'

পরের দিন কাকতালীয়ভাবে সত্যিই ঘরে ফিরতে হল। শ্রীখণ্ড থেকেই একটা বড় পালার বায়না হয়েছিল। বীরভূমের দুবরাজপুরে। কানাই 'মানভঞ্জন' গাইবে। তোড়জোড় চলছে। কিন্তু আমার যাওয়া হল না। বাড়ি থেকে ছোট ভাই এসে উপস্থিত। খবর দিল, মায়ের শরীর খুব খারাপ। এখনই ফিরতে হবে নিমতায়। কীর্তন দলে বেশ দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। আমি তো টাকাপয়সা কিছু চাই না। আমার তো কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আমার চাই নিরন্তর চলা।

কানাইয়ের থেকে অনুমতি নিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। মা আমাকে বুকে চেপে ধরে চোখের জলে আর্দ্র করে দিল। বোনেরা কাঁদতে লাগল। বাবা অভিভাবকের কঠিন কর্তব্যে মৃদু শাসন করলেন মাত্র। এর পরেও মন খারাপ চলল বেশ কিছুদিন। সেই থেকে কীর্তনের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। তারা হয়তো গ্রাম-গঞ্জ-ছোট শহর; একের পর এক পার হয়ে যাচ্ছে। রাতে খোলা মঞ্চে কানাই গাইছে,

'হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।'

বীরেশ্বর লহর তুলছে—ঝিনিদাঘি নাগতেটে নাগতেটে নাগতেটে। বিরাটির বংশী কাউলাত বাজাচ্ছে লখনৌ ঠুংরির সুরের বাঁশি। কিন্তু হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে কে? জানি না।

মায়ের শরীরটা সেরেছে। তাঁর ভবঘুরে মেজছেলেকে নিয়েই তাঁর যত চিন্তা। অনেক দিন কানাইয়ের আখড়ায় যাওয়া হয় না। একান্নবর্তী পরিবার। পারিবারিক আদালতে প্রধান বিচারপতি আমার জ্যাঠামশাই। তিনি রায় দিয়েছেন আর যদি কীর্তনের দলে বেরিয়ে যাই, তাহলে ঘরের দরজা বন্ধ। ধরে নিয়েছি এই শাস্তিই আমার জীবনেরই অঙ্গ। সংসারের বন্ধনে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করছি। ছোটদের পড়াই। এটা ওটা করি। রোজ সকালে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে মা হাতে ধরিয়ে দেন একটা বাজারের থলে। থলে ভরে ফিরে আসি ধ্রুপদী খেয়ালে। মাঝে মাঝে হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসে বাজাই। মন দোলে রে মেরা মন দোলে রে—নাগিনের সুর। নিরুপদ্রব উত্তেজনাহীন এক জগতে বাস করি। মানুষ অসাধারণ অনেক ক্ষমতার অধিকারী। তার একটা হচ্ছে দ্রুত অভ্যস্ত হওয়ার ক্ষমতা।

এরপর এমন একদিন এল, যেদিনের জন্য আমি একদম প্রস্তুত ছিলাম না। আমার ভবঘুরে জীবনে সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এক বিস্ময়কর অনুভব। গুছিয়ে বলা যায় না সে অনুভূতি। মানুষের প্রতি মানুষের বন্ধুত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমত, ধীরে ধীরে যা গড়ে ওঠে সে যে একদিনে এতটা পালটে যেতে পারে, তা ধারণার অতীত। হ্যাঁ ঘড়ির কাঁটা যেমন একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে সকাল থেকে বিকেল নির্দেশ করে, ঠিক সেইরকম। অভিজ্ঞতাটা বলি। পরিবারের নিত্যকর্ম অনুসারে সকাল সকাল বাজার পৌঁছিয়েছি। হঠাৎ দেখি কানাই কীর্তনিয়াকে পুলিশ কোমরে দড়ি পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দু-জন হাবিলদার পিছন থেকে দড়ির গাছাটা শক্ত করে ধরে রেখেছে যাতে পালাতে না পারে।

কানাইয়ের শীর্ণ ও ক্লিষ্ট চেহারা। ওর সাথে চোখাচুখি হতেই সে আমাকে কিছু বলবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। প্রথমটা অবাক হয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। সম্বিত ফিরতেই আর এক মুহূর্ত দেরি করিনি। পড়ি কি মরি করে ছুটে দূরের একটা স্বল্প পরিচিত দোকানে লুকিয়ে পড়লাম। পুলিশ ওকে জীপ গাড়িতে তুলে একরাশ ধুঁয়ো ছেড়ে চলে গেল। পুলিশ চলে গেলে লোকে বলাবলি করতে লাগল, 'ডাকাতি কেস।' কোথায় ডাকাতি করল কানাই? এত বড় কীর্তনিয়া, এত বড় গায়ক, প্রকৃতি যার গলায় এত সুধারস ঢেলে দিয়েছে, তার ডাকাতি করার কী প্রয়োজন হল?

সেদিন বেশি রাতে বীরেশ্বর এল নিজেকে কালো চাদরে মুড়ে। বলল, 'কয়েকদিনের জন্য গা ঢাকা দেন গোঁসাই। বলেছিলাম না এ লাইন আপনার নয়।'

'বিষয়টা খুলে বলেন ভাই।'

'বিষয় আবার কী? রক্তে দস্যুবৃত্তির বীজ বহন করে হরি-কীর্তন...? শ্রীখণ্ডে যে জমিদার বাড়িতে নিমাই সন্ন্যাস পালা গাইলাম, রাতে সেখানে কানাইয়ের বিছানা হল পালঙ্কে, শোবার ঘরে। সেই ঘরেই ওদের সিন্দুক, টাকা-পয়সা, গয়না-গাঁটি। কানাইয়ের যেমন কীর্তনের দল আছে, তেমনই বলাইয়ের আছে ডাকাতের দল। কানাই বলাইয়ের দোসর।'

'বিষয়টা আরও একটু খুলে বলেন ভাই।'

'আমাদের কীর্তনের দল শ্রীখণ্ড ছেড়ে গেল পরের দিন দুপুরে। আগের রাতের 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর রেশ তখনও কেটে যায়নি। আত্মীয়-কুটুম্বরা সব পাত পেড়ে খেয়েছে। সবাই বাড়ি ফেরেনি, থেকেও গেছে কয়েকজন। সব কাজকর্ম মিটিয়ে হ্যাজাক নেবাতে নেবাতে রাত একটা। শেষ রাতের ঘুম বড় গাঢ় হয়। চোখ মেললেও চৈতন্য আসে না। ওরা এল প্রায় দু-ঘণ্টা পরে। রণপায়ে। সংখ্যায় জনা ছয়েকের বেশি নয়। জমিদারের ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে, সিন্দুক ভেঙে কুড়ি ভরি সোনা নিয়ে সর্বনাশ করে দিয়ে গেল।'

'ধরা পড়ল কী করে?'

'হ্যাজাক নিবিয়ে উঠোনে খাটিয়া পেতে শুয়ে ছিল জমিদারের বুড়ো চাকর ন্যোরো। সারা গায়ে প্যাঁচড়া বলে তাকে ঘরে শুতে দেওয়া হয় না। সে নাকি আড়াল থেকে সব দেখেছে। রণপায়ের খটখট আওয়াজেই সে ধড়মড় করে

উঠে বসে। এরপর থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। ডাকাতরা ডাকাতি করে ফেরবার সময় আর রণ-পা খুঁজে পায় না। সকালের পাতলা রোদে দুলে দুলে ওঠে পাটগাছের মাথা। সেখানেই লুকিয়ে ছিল বলাই। সদলবলে ধরা পড়ে যায়।'

একটু থেমে বীরেশ্বর ঢোঁক গিলে বলে, 'শুধু ডাকাতি হলে তেমন কিছু হত না গোঁসাই। বড়জোর কপাল দোষে দু-এক বছর জেল। সঙ্গে খুনও আছে। এক কোপেই জমিদার বাবুর গলার নলিটা ফাঁক করে দিল।'

বীরেশ্বর আর কিছু বলল না। অন্ধকারে এসেছিল। অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল।

সে রাতেই আমার বোঁচকাটা গুছিয়ে নিলাম। প্রায়ান্ধকার রাতে আবার পথে নামলাম। আসক্তিবিহীন ভবঘুরে জীবন। লালন সাঁইয়ের গানটাই আমার জীবনের বিধিলিপি হয়ে রইল। ❑